HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি
টপিক ০২: এডলফ হিটলারের উত্থান
টপিক ০৩: ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি
টপিক ০৪: হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ
টপিক ০৫: জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ
টপিক ০৬: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি
টপিক ০৭: মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ
টপিক ০৮: মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল
টপিক ০৯: মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি
টপিক ১০: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
টপিক ১১: অক্ষশক্তি চুক্তি
টপিক ১২: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১৩: তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা
টপিক ১৪: ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল
টপিক ১৫: জাপানের পরাজয়

টপিক ০১: বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকার ইউরোপের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং ইতালি ও জার্মানিতে একনায়কতন্ত্রের উত্থান। ১৯২০-এর দশকে ইতালিতে এবং ১৯৩০-এর দশকে জার্মানিতে যথাক্রমে বেনিতো মুসোলিনী ও এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান ঘটে। উভয়ক্ষেত্রেই একনায়কতন্ত্রের উত্থানের মূল কারণ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি ক্ষোভ। এই ক্ষোভকে পুঁজি করে উভয় রাষ্ট্রে হিটলার ও মুসোলিনী জাতীয়তাবাদের স্লোগান নিয়ে অতি দ্রুত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাস্তবায়নে অগ্রসর হন। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া এ বিশ্বযুদ্ধ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী লড়াই। ৬ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই থেকেই বিশ্ব এ ধরনের একটি ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছে বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি

আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে জার্মানি ইউরোপে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে একে বিধ্বস্ত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। মিত্রপক্ষের কাছে পরাজয়ের ফলে জার্মানির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক হতাশা নেমে আসে। এই হতাশাকে পুঁজি করে জার্মানিতে এমন এক একনায়কের উত্থান ঘটে যার তুলনা আধুনিক বিশ্বে বিরল। এই একনায়কের নাম হিটলার, যার 'নাৎসিবাদী' আদর্শ আজও বিশ্বের দেশে দেশে ঘৃণার সাথে উচ্চারিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০২ এডলফ হিটলারের উত্থান

টপিক ০২: এডলফ হিটলারের উত্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান সেনাপতি ফন মুলার যেমনটা কামনা করেছিলেন 'হয় সবটা চাই, নতুবা কিছুই চাই না'; বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের কাছে পরাজয়ের পর জার্মানির ভাগ্যে তাই ঘটেছিল। বলতে গেলে এ যুদ্ধে জার্মানি তার সবই হারিয়েছিল; খনি সমৃদ্ধ অঞ্চল, শিল্প, কলকারখানা, মেশিনারিজ, সামরিক শক্তি, বৈদেশিক বাণিজ্য, গৌরব সব। ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী জার্মানি তার খনিসমৃদ্ধ আলসাস ও লোরেন অঞ্চল ফ্রান্সকে প্রদান করতে বাধ্য হয়। জার্মানির একমাত্র ডানজিগ বন্দর জাতিসংঘ অধিগ্রহণ করে। রাইনল্যান্ড ১৫ বছরের জন্য মিত্রপক্ষের দখলে চলে যায়। কয়লা খনিসমৃদ্ধ 'সার' জেলা ১৫ বছরের জন্য ফ্রান্স তার দখলে রাখে। জার্মানির রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। মিত্রপক্ষকে জার্মানি কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। এসব কারণে জার্মানির অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা

ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী সামরিক বাহিনী ভেঙে দেয়া হলে বিপুল সংখ্যক সৈনিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জার্মানির জনজীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলে। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলো জার্মান মুদ্রা মার্কের সাথে বিনিময় হার বৃদ্ধি করার ফলে মার্কের মূল্য পতন ঘটে। ১৯১৪ সালে যেখানে ডলারের বিপরীতে 'মার্ক' পাওয়া যেত ১: ৪.২ হারে সেখানে ১৯১৬ সালে বিনিময় হার দাঁড়ায় ১: ৮.৯। ১৯১৪ সালে পাউন্ড ও মার্কের বিনিময় হার ছিল ১: ১৫। ১৯২২ সালে বিনিময় হার দাঁড়ায় ১: ৭৬০। ১৯২৩ সালে ১ পাউন্ডের বিনিময়ে মার্ক পাওয়া যেত ৭২০০০। এর ফলে লোকে বস্তা ভরে মার্ক নিয়ে বাজারে যেত, আর তা দিয়ে মুঠো ভরে খাদ্য কিনতে সক্ষম হতো।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা

মিত্রপক্ষ যুদ্ধের জন্য জার্মানির ওপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দিলে জার্মান অর্থনীতি ভয়ানক চাপে পড়ে। এর সাথে ত্রিশের দশকে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হলে জার্মানির রপ্তানি বাণিজ্যেও ধস নামে। ১৯২৯ সালে জার্মানির রপ্তানি বাণিজ্য ৬৩ কোটি পাউন্ড থেকে ১৯৩০ সালে ২৩ কোটি পাউন্ডে নেমে আসে। জার্মানির তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১৯২৯ সালে যেখানে ছিল ২০ লাখ। ১৯৩২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ লাখে। হাজার হাজার কলকারখানা-ব্রিজ-কালভার্ট, অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় জার্মানি একটি পোড়াবাড়িতে পরিণত হয়েছিল।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সামাজিক জীবনে ভয়ানক উত্থান-পতন ঘটে। যুদ্ধে জার্মানির ২০ লাখ সৈনিক মৃত্যুবরণ করে, ৪০ লাখ অফিসার ও সৈনিক আহত হয়, ১০ লাখ সৈনিক বন্দি হয়। এর ফলে জার্মানির সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য মার্ক-এর মূল্যপতন ঘটলে যে সব ধনী জার্মানের ঘরে কোটি কোটি মার্ক জমা ছিল তারা হঠাৎ দরিদ্র হয়ে যায়। শিল্প, কলকারখানা বিধ্বস্ত হলে অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়া হলে বেকার সৈনিকরা গ্রামীণ জীবনে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। এর ফলে এরা শহরে নানাবিধ অনাচারমূলক কাজে লিপ্ত হয়। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির সামাজিক অবস্থা

জার্মান জাতি আত্মগর্বে গর্বিত জাতি। যুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও তারা লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। ওয়েমার প্রজাতন্ত্র বাস্তবতা উপলব্ধি করে পরাজয় স্বীকার করে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর' করতে বাধ্য হলেও জার্মান জনতা এ পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে যুদ্ধের পর শত দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা সত্ত্বেও তারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। হিটলার জার্মান সমাজের এ মনোভাবকেই কাজে লাগিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। জার্মানি যখন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে মিত্রশক্তির সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল তখনই জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামে। ক্রমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। যুদ্ধের ফলে প্রবল খাদ্যাভাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সময় মিত্রপক্ষের প্রচারণায় জার্মানিতে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যুদ্ধের শেষের দিকে কিয়েল বন্দরে জার্মান নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করে। তারা সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদলে শ্রমিক ও সৈনিকদের সমন্বয়ে 'সোভিয়েত' গঠন করে। ক্রমে জার্মানির আরও কয়েকটি শহরে কিয়েল-এর অনুকরণে সোভিয়েত গঠিত হয়। দক্ষিণ জার্মানির ব্যাভারিয়াতেও অনুরূপ সোভিয়েত গঠিত হলে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বুঝতে পারেন জার্মানির অন্তর্বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মরক্ষার্থে তিনি পদত্যাগ করে নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ডে) পলায়ন করেন। এভাবে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। কাইজারের পতনের পর জার্মানির বিভিন্ন প্রদেশের রাজারাও একে একে পদত্যাগ করেন। অতঃপর জনপ্রিয় সমাজতন্ত্রী নেতা ফ্রেডারিক এবার্টের (Ebert) নেতৃত্বে জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় জার্মানিতে দুটি দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রিয়াশীল ছিল। একটি ছিল জার্মান সমাজতন্ত্রী দল এবং অপরটি ছিল জার্মান কমিউনিস্ট দল। শেষোক্ত দলটি স্পার্টাসিস্ট (Spartacist) নামে পরিচিত ছিল।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থা

সমাজতন্ত্রী দল ছিল বহুধাবিভক্ত। এরা ভূমি সংস্কার ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তেমন আন্তরিক ছিল না। তবে এদের সমর্থক ছিল প্রচুর। এর ফলে এবার্টের নেতৃত্বে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি অতটা মজবুত ছিল না। স্পার্টাসিস্ট দল ছিল গোঁড়া কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুসারী। তারা শুধু রাজতন্ত্রের পতনেই সন্তুষ্ট ছিল না, জার্মানির সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন করতেও চেয়েছিল। যেহেতু তাদের সমর্থকের সংখ্যা ছিল খুবই কম সেহেতু তারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে।

এডলফ হিটলারের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থা

কার্ল লাইবনেষ্ট এবং রোজা লুক্সেমবার্গের নেতৃত্বে স্পার্টাসিস্ট দল ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিন অবরোধ করে। প্রজাতন্ত্রী নেতা এবার্ট ও তার সহকর্মীরা বার্লিনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সরকার সমর্থক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা Free Core সদস্যরা সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসে। বার্লিনের প্রজাতন্ত্র সমর্থক জনগণও স্পার্টাসিস্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এর ফলে স্পার্টাসিস্টদের অবরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বহু স্পার্টাসিস্টকে হত্যা করে বার্লিন নগরীকে অবরোধ মুক্ত করে। জনতা লুক্সেমবার্গ ও লাইবনেষ্টকে হত্যা করে।

সরকারি বাহিনী মিউনিখ ও ব্যাভারিয়ার কমিউনিস্ট বিদ্রোহও দমন করতে সমর্থ হয়। এরপর এবার্ট সরকার একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। এতে ৪২৩ সদস্যের জাতীয় সভার ১৬৫ জন এবার্ট সমর্থক নির্বাচিত হন। এ সভা এবার্টকে স্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেয় এবং একটি সংবিধান প্রণয়ন করে যা ওয়েমার বা ভাইমার সংবিধান নামে পরিচিত। এরপর জার্মানির নবগঠিত প্রজাতন্ত্র ওয়েমার প্রজাতন্ত্র (Weimer Republic) নামে পরিচিতি লাভ করে। মিত্রপক্ষ ওয়েমার প্রজাতন্ত্রকে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৩ ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

টপিক ০৩: ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

ওয়েমার সংবিধান ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক সংবিধান। এতে জার্মানিকে একটি ফেডারেশনে রূপান্তরিত করে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়। এ সভার সদস্যবৃন্দ ২০ বছর বয়সী জার্মান নর-নারীদের গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এতে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। যেকোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ সংবিধানে বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার রক্ষার স্বাধীনতা, নাগরিকের সমান অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদির স্বীকৃতি দেয়া হয়।

তারপরও এ সংবিধানের অধীনে ওয়েমার প্রজাতন্ত্র জার্মান জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এর কারণ-

ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

ক. কাইজার এবং বিভিন্ন রাজারা পদত্যাগ করলেও কাইজারের আমলের আমলাবৃন্দ, সামরিক কর্তাব্যক্তি, শিল্পপতিশ্রেণি, পেশাজীবীশ্রেণি এ সংবিধানের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। তারা ছিল কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাসম্পন্ন।

খ. যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং ওয়েমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রায় সমসাময়িক হওয়ায় নাৎসিদল ভার্সাই সন্ধির জন্য ওয়েমার প্রজাতন্ত্র দায়ী বলে মিথ্যা প্রচার করলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং এতে ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

গ. পুলিশ প্রশাসন, প্রজাতন্ত্রী সেনাদলের অধিকাংশ সেনা ও অফিসার কাইজারের রাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি অনুরক্ত ছিল। উপরিউক্ত কারণে ওয়েমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরপরই জার্মানির বিভিন্ন বিরোধী শক্তি এ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। চরম বামপন্থি ও চরম ডানপন্থি দলগুলো এ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণায় নামে। নাৎসি দল প্রচার করে যে, ওয়েমার সরকার জার্মান জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে এ সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

মিত্রশক্তি ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে জার্মান সেনাদল ভেঙে দেয়ার জন্য চাপ দিলে প্রজাতন্ত্রী সরকার নৌ-বাহিনীর একাংশ ভেঙে দেয়ার ঘোষণা দিলে ১৯২০ সালে উলঙ্গ্যাং নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জার্মান নৌ-সেনারা বার্লিন দখল করে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন করে। কিন্তু জার্মান কমিউনিস্টরা এ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু করলে এ সরকারের পতন ঘটে। এ সময় দক্ষিণপন্থি নাৎসি দল অনুভব করে যে, প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করতে হলে যুদ্ধ ফেরত Free Core সৈনিকদের সমর্থন প্রয়োজন হবে। কেননা, এই সেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে প্রজাতন্ত্রী দলের সামরিক অফিসারদের যোগাযোগ ছিল। অফিসাররা গোপনে তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতেন। নাৎসিদল ধীরে ধীরে এদেরকে নিজস্ব জঙ্গি বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ব্যাভারিয়াকে কেন্দ্র করে প্রজাতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের ছক তৈরি করে। এ সময় জার্মান কমিউনিস্ট দল ব্যাভারিয়াতে বিদ্রোহ করে বিপ্লবী সরকার গঠন করলে প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার এদের দমন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু হিটলার তার জঙ্গি বাহিনীর সাহায্যে এ কমিউনিস্ট বিপ্লবকে ধ্বংস করে সাধারণ লোকের আস্থা অর্জনে সমর্থ হন। ক্রমে প্রজাতন্ত্রী দলের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

১৯২৯ সালে গুস্টাফ স্ট্রাসম্যানের মতো বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মৃত্যু হলে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার মতো আর কোনো বিচক্ষণ নেতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৩০ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চরম সমস্যায় নিপতিত হয়। ফলে মার্কিন সাহায্য না পেয়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার চরম অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। বিশ্বমন্দার বিরুদ্ধে জার্মানি অস্ট্রিয়ার সাথে 'শুল্ক জোট' বা অর্থনৈতিক জোট গঠন করে টিকে থাকার চেষ্টা করেছিল।

ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ও জার্মানি

কিন্তু মিত্রপক্ষের বিরোধিতায় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে জার্মানিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক ধ্বস নামে, বুর্জোয়াশ্রেণি প্রজাতন্ত্রী সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এ বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করলে নাৎসিদল বেকারদের চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে ১৯৩২ সালের নির্বাচনে আইনসভায় নাৎসিদল ১০৭টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্য দলগুলো কেউই এত সংখ্যক আসন লাভ করতে সক্ষম না হওয়ায় জার্মান রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবার্গ নাৎসিনেতা হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন।

ইতোমধ্যে আইনসভায় (রাইখস্ট্যাগে) আগুন লাগলে হিটলার এর জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেন। অতঃপর ১৯৩৩ সালের ৫ মার্চ এক সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে হিটলারের নাৎসিদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ মারা গেলে হিটলার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট উভয় পদ দখল করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৪ হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

টপিক ০৪: হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

বিশ শতকের রাজনীতির ইতিহাসে এডলফ হিটলার (Adolf Hitler) অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা অ্যালোয়েস ছিলেন শুল্ক বিভাগের সামান্য চাকুরে আর মা ক্লারা ছিলেন কৃষিজীবী। বাল্যকালেই পিতার মৃত্যুতে হিটলার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। হিটলার চেয়েছিলেন একজন চিত্রশিল্পী হবেন। লাসবাক, লিনৎস ও স্ট্রেইয়ারে স্কুলজীবন সমাপ্ত করে তিনি রাজধানী ভিয়েনায় গমন করেন। কিন্তু ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি কিছুদিন প্রেসে কাজ করেন। ১৯১৯ সালে হিটলার জার্মান শ্রমিক দলে যোগ দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাগ্মিতায় সবার নজর কাড়তে সক্ষম হন। এ সময় জার্মানির অধিকাংশ দলের মতো জার্মান শ্রমিক দলেরও সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। তিনি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন। সামরিক প্রশিক্ষণ এ ক্ষেত্রে তার সহায়ক হয়। ফলে দু'বছরের মধ্যেই এ দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; সংগঠনও দৃঢ় হয়।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

হিটলার দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী জার্মান শ্রমিক দল (National Socialist German Workers Party) সংক্ষেপে নাৎসি পার্টি বা নাজি পার্টি। ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা ও জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতার ওপর জোর দিয়ে ১৯২০ সালে হিটলার তার পার্টির কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচিতে তিনি ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করেন। বেকারদের কর্মসংস্থান, মুনাফাখোরদের উচ্ছেদ, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি ছিল এ কর্মসূচির লক্ষ্য। হিটলারের প্রচারসেল এত বেশি শক্তিশালী ছিল যে অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধফেরত সৈনিক, রক্ষণশীল রাজতন্ত্রী, দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসায়ী, হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক, ক্যাথলিক, ইহুদি ও কমিউনিস্টবিরোধীরা হিটলারের দলে সমবেত হয়।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

হিটলার নাৎসিদলের নেতৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করার পর গোয়েরিং, হেস, রোজেনবুর্গ, বোয়েম, গোয়েবলস প্রমুখ সহকর্মীদের নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করেন। দলীয় মুখপত্র হিসেবে 'পিপল্স অবজার্ভার' নামে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। দলীয় স্বার্থরক্ষা ও নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার জন্য হিটলার এক ঝটিকা বাহিনী গঠন করেন যার নাম ছিল Sturmabteilung বা সংক্ষেপে S.A বাহিনী। এছাড়া তিনি তার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনী Schutzstaffel বা S.S গঠন করেন। অন্যান্য নাৎসি কর্মীরা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করত। এদের পোশাকের রং ছিল বাদামি। হিটলার তার কর্মীবাহিনীকে সামরিক বাহিনীর সমান্তরাল এক বাহিনীর মতো করে গড়ে তোলেন।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

১৯২৩ সালে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে হিটলার ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বিচারে তার পাঁচ বছরের জেল হয়। জেলখানায় অবস্থানকালেই তিনি তার বিখ্যাত Mein kampf বা আমার জীবনী বলে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জীবনীগ্রন্থ বলা হলেও এটি ছিল আসলে নাৎসিদের বাইবেলস্বরূপ। এ গ্রন্থে তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে তা তরুণ সমাজের কাছে অবশ্য পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। এ গ্রন্থে তিনি নাৎসি আদর্শ, এ আদর্শ বাস্তবায়নের উপায় ইত্যাদি বিশদ ব্যাখ্যা করেন। সরকারি দমন-পীড়নে এবং নাৎসিদল নিষিদ্ধ করার ফলে ১৯২৪ সালের নির্বাচনে দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯২৮ সালে আবার দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯২৯-৩২ সালের মধ্যে বিশ্বমন্দা ইত্যাদি কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হলে এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নাৎসিদলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

১৯৩৩ সালের নির্বাচনে নাৎসিদল সরকার গঠনে সমর্থ হয়। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পল ভন হিন্ডেনবার্গ এডলফ হিটলারকে ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কাস পার্টির নেতা (Fuhrer) হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৪ সালের ২৪ জুলাই নাৎসিদল ছাড়া অপর সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ওয়েমার সংবিধান স্থগিত করা হলো। ফ্যাসিস্ট লেই-এর নেতৃত্বে একটি ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া অপর সব ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এভাবে জার্মানিতে হিটলার সর্বময় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

হিটলারের মূল লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির অভিশাপ থেকে জার্মান জাতিকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নাৎসি তত্ত্বে বলা হয়েছিল জার্মানরা আর্য জাতির বংশধর। আর্যদের মধ্যে নর্ডিকরাই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, 'নর্ডিক' আর্য হওয়ার কারণে জার্মান জাতির দায়িত্বই হলো বিশ্বকে পদানত করে শাসন করা। এভাবে নাৎসিরা উগ্র জার্মান-জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ১৯৩৩ সালেই জার্মানি জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে। এরপর হিটলার ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করে ফ্রান্সের কাছে তার আলসাস ও লোরেন, সার অঞ্চল এবং পোল্যান্ডের কাছে ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডোর ফেরত চান। বৃহত্তম জার্মানি গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ার অঞ্চলসমূহ এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদেতানল্যান্ড'ও দাবি করেন। হিটলার বলেন, 'জার্মান ঐক্য আন্দোলনে অস্ট্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত না করে বিসমার্ক যে ভুল করেছিলেন, তার কর্তব্য হলো সেই ঐতিহাসিক ভ্রান্তিকে দূর করা'।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

১৯৩৪ সালে হিটলার পোল্যান্ডের সাথে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে অস্ট্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেন। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর 'ডলফাস' (Dollfuss) নাৎসি ঘাতকদের মাধ্যমে নিহত হলে হিটলার সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতালির মুসোলিনী এর প্রতিবাদে সৈন্য প্রেরণ করলে হিটলার আপাতত পিছিয়ে আসেন।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

ভার্সাই সন্ধি মোতাবেক ১৯৩৫ সালে 'সার' অঞ্চলে গণভোটের জন্য প্রস্তুতি শুরু হলে নাৎসি প্রচারকর্মীরা ব্যাপক প্রচার শুরু করে। 'সার'-এর অধিবাসীরা জার্মানির সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য মত প্রকাশ করে। ১৯৩৬ সালে হিটলার রাইনল্যান্ড দখল করে নেন। একই বছর হিটলার 'রোম-বার্লিন' চুক্তি করে আবিসিনিয়ায় ইতালীয় যুদ্ধকে সমর্থন জানান। একই বছর নভেম্বরে হিটলার জাপানের সাথে কমিউনিস্টবিরোধী (Anti-Comintern Treaty) চুক্তির মাধ্যমে ইতালি-জার্মানি-জাপান ত্রিশক্তি জোট গড়ে তোলেন যা ইতিহাসে 'অক্ষশক্তি' নামে পরিচিত। অতঃপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদেতেন' অঞ্চলের দিকে নজর দেন। এ জেলাতে সাড়ে তিন মিলিয়ন জার্মান অধিবাসী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিটলারের নির্দেশে নাৎসিরা জার্মান-চেক সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে এ অজুহাতে জার্মানি সুদেতেন অঞ্চল দখল করে নেয়। এভাবে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনী একে একে ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী জার্মান সীমানার প্রায় সমস্ত অঞ্চল পুনরাধিকার করতে সক্ষম হয়। জার্মানি সামরিক শিল্পে নজর দেয়। তার সেনাবাহিনীকে ৩৫ ডিভিশনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। জার্মান জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানী-শ্রমিকরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রণতরি, ট্যাংক, বিমান, কামানসহ সাজোয়া যান, বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদ করতে সক্ষম হয়। এরপর জার্মানি পোল্যান্ডের দিকে নজর দেয়।

হিটলারের ক্ষমতারোহণঃ নাৎসিবাদ

পোল্যান্ড আক্রমণের পূর্বে হিটলার একের পর এক কৌশলী নীতি প্রয়োগ করে রাশিয়াকে পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এরপর ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার জার্মান বাহিনীকে পোল্যান্ড আক্রমণের নির্দেশ দিলে ওই বছরই ৩ সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

হিটলার ১৯৪৫ সালে ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার আগেই ফিউরার বাঙ্কারে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৫ জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

টপিক ০৫: জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

This Topic is important for

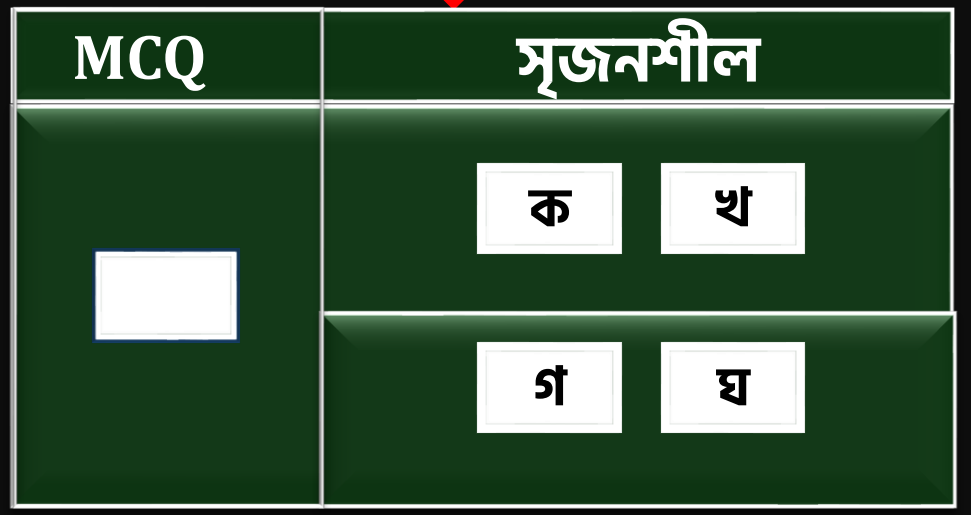

জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

প্রথমত, জার্মান জাতি ছিল আত্মগবী জাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের কাছে পরাজয় তারা মেনে নিতে পারেনি। অধিকাংশ জার্মান মনে করত যে, জার্মানি আত্মসমর্পণ না করে যদি যুদ্ধ চালিয়ে যেত তাহলে পরাজয় এড়ানো সম্ভব হতো। হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিদল একই মত পোষণ করে। নাৎসিদল প্রচার করে, ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র সরকার জার্মানির জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে নাৎসিদল ও হিটলার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাৎসিদের নিরন্তর প্রচারণায় জার্মান জনগণের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়, একমাত্র নাৎসিদলই জার্মানির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

দ্বিতীয়ত, জার্মান পুঁজিবাদী শিল্পমালিক ও বুর্জোয়াশ্রেণি কমিউনিস্টদের পছন্দ করেনি। নাৎসিদলও কমিউনিস্টবিরোধী হওয়ায় জার্মান বুর্জোয়ারা হিটলারের প্রতি অনুরুক্ত হয়। জার্মান পুঁজিপতিরা কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য হিটলারের এস.এস. বাহিনী গঠনের জন্য অর্থ যোগান দেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নিলেও হিটলার তার ঝটিকা বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্ট শ্রমিক সংঘগুলো ভেঙে দেন; অব্যাহত আক্রমণের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করে ফেলেন। ফলে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এমনকি বলপ্রয়োগ করে ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে নাৎসিদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়।

জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

তৃতীয়ত, ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিলে এবং জার্মান মুদ্রা 'মার্কের' মূল্যমান কমে গেলে প্রজাতন্ত্রী সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে, হিটলার সবার জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিলে জনগণ নাৎসিদলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

চতুর্থত, ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু হিটলারের নাৎসিদলের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। তারা মনে করত জার্মানি ক্ষতিপূরণ দিতে নৈতিকভাবে বাধ্য নয়, কেননা যুদ্ধের জন্য এককভাবে সে দায়ী নয়। নাৎসিদল আরও বলে, বেকার সমস্যা, খাদ্যসংকট, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে জার্মানি কোনোমতেই ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। নাৎসিদের এ বক্তব্য সব শ্রেণি-পেশার জার্মানদের মন জয় করে নেয়।

জার্মানিতে নাৎসিবাদ ও হিটলারের উত্থানের কারণ

পঞ্চমত, জার্মান জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রচার এবং জার্মানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি- এ ধারণার ব্যাপক প্রচার নাৎসিদলকে তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে।

ষষ্ঠত, নাৎসিদলের জনপ্রিয়তার অপর কারণ ছিল হিটলারের অসাধারণ বাগ্মিতা ও সম্মোহনী ক্ষমতা। তিনি কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদার পরিবর্তে গুণ ও আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় জার্মান জাতির হৃতগৌরবের কথা বলে সমগ্র জাতির মনোবল বাড়াতে সক্ষম হন। এর ফলে জার্মান জাতি হিটলারকে 'মুক্তিদাতা' বলে গণ্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৬ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

টপিক ০৬: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

ইতালি প্রাচীন ঐতিহ্যের দেশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইতালি পুরো ইউরোপকে পথ দেখিয়েছে। রোমান সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়নি এমন কোনো দেশ ইউরোপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই ইতালি আধুনিক যুগে এসে শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায় নিদারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা ও শিল্পে অনগ্রসরতা ইতালির জনগণকে নিদারুণ হতাশায় নিমজ্জিত করেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ইতালির উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সরকার মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভার্সাই সন্ধিতে ইতালিকে কোনো কিছু না দেওয়ায় ইতালির জনগণ নিজেদের প্রতারিত বলে ভাবতে শুরু করে। ইতালির জাতীয়তাবাদী জনতা মনে করে 'ইতালি বিশ্বযুদ্ধে রক্ত ও জীবন ক্ষয় করলেও শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।' জনগণের এ হতাশাবোধকে কাজে লাগিয়েই ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতায় আসে এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

ইতালি ছিল ভূ-মধ্যসাগরের বন্দি, কেননা। এর তিন দিকই ভূ-মধ্যসাগর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এ সাগর থেকে বের হবার ৩টি পথ-জিব্রাল্টার প্রণালি, দার্দানেলিশ প্রণালি ও সুয়েজখাল ব্রিটিশ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করত। স্থল পথে ইতালি আল্পস পর্বতমালা দ্বারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় সমুদ্রপথে তাকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিতে হতো। ইতালি মনে করেছিল, বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিলে তার সমুদ্রপথে অবাধ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জার্মানিকে পরাজিত করতে সমর্থ হলে আড্রিয়াটিক সাগরের অপর তীরের ট্রিয়েস্ট, ট্রেন্টিনো ও ডালমাশিয়া অঞ্চল তার হাতে এসে পড়বে। আড্রিয়াটিকের অপর পাড়ের 'ফিউম' বন্দরটি পেলে তার বাণিজ্যে সুবিধা হতো। ইতালিতে কয়লা, লৌহ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য শিল্পে সে পিছিয়ে ছিল। এজন্য সে জার্মানির উপনিবেশগুলো এবং উত্তর আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশের একাংশ লাভকরতে চেয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইতালি জার্মানির সাথে চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব করলেও গোপনে ফ্রান্সের সাথেও বন্ধুত্ব চুক্তি করেছিল। ইতালির ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে ছিল না; এজন্য যুদ্ধের শুরুতে ইতালি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। কিন্তু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ইতালির গণতান্ত্রিক সরকার শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষে
যোগ দেয় এই আশায় যে, তার আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হবে। যুদ্ধ শেষে ভার্সাই সন্ধিতে ইতালির দাবিগুলো একে একে প্রত্যাখ্যাত হলে ইতালির প্রতিনিধি কাউন্ট অ্যান্ডো ভার্সাই সন্ধির বৈঠক ত্যাগ করে চলে আসেন। এ ব্যর্থতার জন্য বিরোধী দল ইতালির উদারনৈতিক সরকারি দলকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ইতালি লাভবান হওয়া তো দূরের কথা; বরং এ যুদ্ধ তার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেলেও কলকারখানায় মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়ায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পতিত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ কমে গেলে জনজীবনে হাহাকার দেখা দেয়। এর সাথে যুদ্ধফেরত বেকার সৈন্যরা যুক্ত হলে বেকারত্ব চরমে ওঠে। ইতালির উদারনৈতিক সরকার হয়তো ধীরে ধীরে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারত কিন্তু সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ সরকারের ওপর ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে ইতালির জনগণের মাঝে সমাজতন্ত্র দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ন্যায্য মজুরি, কৃষির জন্য জমিলাভ ইত্যাদি কারণে শ্রমিক ও কৃষকরা যথাক্রমে শিল্পমালিক ও ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। স্থানে স্থানে শ্রমিকরা কলকারখানা এবং সংঘবদ্ধ কৃষকরা জমিদারদের জমি দখল করতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

উগ্র সমাজতন্ত্রীরা প্রলেতারিয়েতদের (সর্বহারা) ক্ষেপিয়ে তুললে উদারনৈতিক সরকার ক্রমেই দেশের পরিস্থিতির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। এর ফলে ইতালির বেশিরভাগ মানুষ মনে করতে থাকে যে, এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় মাত্র দুটি- হয় সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করতে হবে নতুবা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমিউনিজমের উত্থান রোধ করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণি ও শিল্পপতি, বৃহৎ ভূ-স্বামীরা একনায়কতন্ত্রকেই শ্রেয় বলে মনে করে। তারা একটি শক্তিশালী সরকারই তাদের কায়েমি স্বার্থরক্ষা করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। এর ফলে তারা ফ্যাসিস্ট দলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। এভাবে ধনী বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে বেনিতো মুসোলিনী তার ফ্যাসিবাদকে
* অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইতালি

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৭ মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

টপিক ০৭: মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের জনক হলেন বেনিতো মুসোলিনী। ইতালীয় শব্দ Fascio থেকে Fascism শব্দটির উদ্ভব। এর একটি অর্থ 'বল' বা শক্তি। এর অপর অর্থ 'গুচ্ছ' বা আঁটি (Bundle)। ইতালির সিসিলি দ্বীপে উনিশ শতকের শেষের দিকে জমিদারবিরোধী কৃষক সংগঠনগুলো একটি প্রতীক ব্যবহার করত। এ প্রতীকে বিভিন্ন উদ্ভিদের 'কাণ্ডগুচ্ছ' উৎকীর্ণ থাকত। এর মাধ্যমে তারা বুঝাতে চাইতো যে একটি কান্ড ভাঙা সহজ কিন্তু কান্ডের গুচ্ছকে ভাঙা সহজ নয়। অর্থাৎ 'একতাই শক্তি'। মুসোলিনী তার দলের নাম হিসেবে তাই 'Fascio' শব্দটিকে গ্রহণ করেন এবং তার প্রবর্তিত মতবাদই হলো ফ্যাসিবাদ (Fascism)। ফ্যাসিবাদের মূলমন্ত্র হলো, 'রাষ্ট্রই সকল শক্তির আধার'। এ মতবাদের মাধ্যমে মুসোলিনী ইতালিকে একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

জন্ম ও বাল্যকাল

১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই উত্তর ইতালির রোমানা অঞ্চলের প্রিডাপিও নামক এক গ্রামে বেনিতো মুসোলিনী (Benito Mussolini) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন কর্মকার এবং মাতা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে মুসোলিনী মায়ের ইচ্ছানুসারে 'নর্মাল ট্রেনিং' শেষ করে স্কুলে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে সুইজারল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেখানে তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা পরিচালনা করে বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। সুইস সরকার এতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিলে মুসোলিনী ইতালিতে ফিরে আসেন।

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

রাজনীতিতে প্রবেশ

অতঃপর তিনি সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এজন্য তাকে ১৯১১ সালে কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯১২ সালে মুক্তি পেয়ে সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র 'আভান্তি' (Avante) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুসোলিনী যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। ইতালির সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিপক্ষে ছিল। এজন্য মুসোলিনীর সাথে তাদের মতবিরোধ ঘটে এবং তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি Popolo di Italia (পপোলও দি ইতালিয়া) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যুদ্ধ শেষে মুসোলিনী দেশে ফিরে এসে দেখেন ইতালির আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

দলগঠন

১৯১৯ সালে তিনি মিলানে কর্মচ্যুত সৈনিক এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী একদল উৎসাহী জাতীয়তাবাদী যুবকের সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনেই তিনি ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন এবং ইতালির জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।

মুসোলিনী ঘোষণা করেন, তিনি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে মুক্ত করবেন এবং কমিউনিজম দূর করবেন। তিনি তার দলের সদস্যদের জন্য কালো পোশাক নির্ধারণ, সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ চালু করেন। এতে তার দল সামরিক ভাবধারার সংগঠনে পরিণত হয়। এরপর তার দল সমাজতন্ত্রীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বুর্জোয়া ও ধনী শিল্পপতিরা কমিউনিজম ঠেকাতে মুসোলিনীকে অকাতরে আর্থিক সাহায্য দিতে থাকে। ফ্যাসিবাদীরা সমাজতন্ত্রীদের সভা-সমিতি আক্রমণ করে। প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী নেতাদের ভীতি প্রদর্শন করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা করতে থাকে। সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় প্রকারান্তরে ফ্যাসিবাদীদের সুবিধা হয়। বলশেভিক বিপ্লব বলতে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়া রুশ বিপ্লবকে বোঝায়।

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

দলগঠন

১৯২০ সালে সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপক ধর্মঘটের মাধ্যমে কল-কারখানাগুলো দখল করে নিলে ইতালিতে 'বলশেভিক বিপ্লব'-এর মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জনসাধারণ সমাজতন্ত্রীদের মোকাবিলা করতে সমর্থ না হওয়ায় 'ফ্যাসিস্টদের' শরণাপন্ন হয়। শিল্পপতি, জমিদার ও মধ্যবিত্তরা অযোগ্য সরকারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মুসোলিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসে।

মুসোলিনীর উত্থানঃ ফ্যাসিবাদ

দলগঠন

১৯২১ সালের নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী পার্টি ১২৩টি, পিপলস পার্টি ১০৮টি, কমিউনিস্ট পার্টি ১৫টি এবং ফ্যাসিস্ট দল ৩৫টি আসন লাভ করে। এটি ছিল ফ্যাসিস্টদের জন্য বিরাট বিজয়। কেননা মাত্র দু'বছর পূর্বেও তাদের তেমন কোনো জনসমর্থন ছিল না। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে মিলান শহরে সমাজতন্ত্রীরা যেখানে পেয়েছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার ভোট সেখানে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল পেয়েছিল মাত্র ৪ হাজার ৮ শত ভোট। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ফ্যাসিস্টরা কর্মহীন শ্রমিক, বেকার যুবক, ভবঘুরে, মাস্তান, অপরাধী আর কমিউনিস্ট বিরোধী ধনী বুর্জোয়াদের সমর্থন নিয়ে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৮ মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

টপিক ০৮: মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

ফ্যাসিস্টরা ১৯২১ সালের নভেম্বরে National Fascist Party গঠন করে মুসোলিনীকে এর দুচে (Duce) বা নেতা নির্বাচিত করে। এরপর থেকে ফ্যাসিস্টরা আরও সংগঠিত হয়ে একটি সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নির্বাচন পরবর্তী অরাজকতা দূর করতে সরকার ব্যর্থ হলে মুসোলিনী দুর্বল সরকারকে উচ্ছেদ করে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা পুনস্থাপনে বদ্ধপরিকর হলেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের গ্রীষ্মে তিনি অভিযান শুরু করলেন। 'পার্মায়' ফ্যাসিস্ট বনাম 'জনতা'র মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলে ভ্যাটিকানের রাজা 'নিরপেক্ষতার' ভান করে। ২৮ অক্টোবর ফ্যাসিস্টরা রোম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। রাজা ফ্যাসিস্টদের দমন করার জন্য কোনো বাহিনী প্রেরণ করতে অস্বীকার করলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

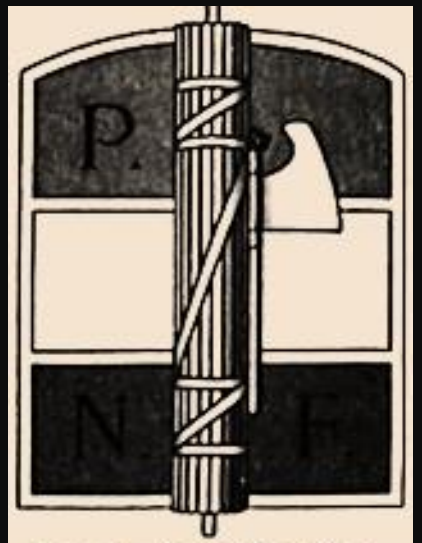

ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতীক

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

মুসোলিনী কতিপয় রাজনীতিবিদের সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে এবং রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল-এর সম্মতি নিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। এমনকি রাজা মুসোলিনীর সরকারে তার মনোনীত ৪ জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলেও মুসোলিনী তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৩০ অক্টোবর মুসোলিনী কালো জামা ও টুপি পরিহিত অবস্থায় মিলান থেকে ট্রেনযোগে রোমস্থ সরকারি প্রাসাদে প্রবেশ করেন। সংসদে তাকে লিবারেল গোষ্ঠী ও ক্যাথলিকরা সমর্থন দান করেন। এভাবেই কোনো প্রস্তুতি ছাড়া শুধু লংমার্চের মাধ্যমেই বিনাযুদ্ধে ফ্যাসিস্টরা ইতালির ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়েছিল।

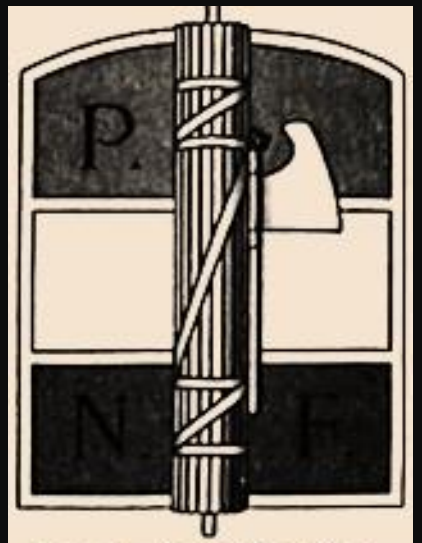

ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতীক

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করলেও মুসোলিনী দ্রুত জরুরি ক্ষমতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব সরকারি প্রশাসন ও অন্যান্য সব দপ্তরে ফ্যাসিকরণ নীতি চালু করেন। সমাজতন্ত্রী দলকে চূর্ণ করা হয় এবং সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা 'আভান্তির' কার্যালয় ধ্বংস করা হয়। বিরোধী দলগুলোকে কঠোর হাতে দমন করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত করা হয়। আইনসভায় বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং একদলীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলোকে ফ্যাসিস্ট দলের অনুকূলে প্রণয়ন করা হয়। মুসোলিনী 'চেম্বার অব ডিপুটিস' নামক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে ২২টি প্রতিষ্ঠানের একটি কাউন্সিল গঠন করেন।

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১৯২৪ সালে এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করে মুসোলিনী প্রায় ৬৫% ভোট সংগ্রহ করলেন। ১৯২৫ সালে তিনি 'ইল দুচে' (Duce) বা নেতা উপাধি গ্রহণ করে ডিক্টেটরে পরিণত হলেন। পৌরসভা, বিদ্যালয়, অফিস, শ্রমিক সংগঠন সর্বত্রই ফ্যাসিস্ট প্রাধান্য স্থাপিত হলো। ফ্যাসিস্টদের ভয়ে অনেকে রাজনীতি ছেড়ে দিল। অনেকে ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল, আবার অনেকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হত্যা-নির্যাতনের শিকার হলো। একনায়কত্ব কায়েম করার পর মুসোলিনী ঘোষণা করলেন, 'দেশের সব কিছুই হবে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছুই থাকবে না; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছুই সহ্য করা হবে না।'

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

ফ্যাসিবাদের মূলনীতি

ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রের মতো কোনো গভীর সামাজিক দর্শন ছিল না। ফ্যাসিবাদ ছিল আসলে ইতালির সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের একটি রাজনৈতিক ব্যভিচার। মুসোলিনী প্রথম জীবনে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে কমিউনিজমের চরম শত্রুতে পরিণত হন। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে, তিনি গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী কোনোটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতালিপ্স। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য যাকে যেভাবে 'Convince' করা দরকার ফ্যাসিস্টরা সেভাবেই প্রচারণা চালিয়েছিল। তবে ফ্যাসিস্টরা সর্বাত্মকবাদে বিশ্বাসী ছিল। জনমত, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রথাকে ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতো। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করে ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেই চূড়ান্ত মনে করতো। এজন্য এরা ছিল কর্তৃত্ববাদী। শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। শৃঙ্খলাভঙ্গের অর্থই ছিল রাষ্ট্রদ্রোহীতা। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদে নাগরিকদের প্রতিবাদের অধিকার ছিল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফ্যাসিবাদে স্বীকার করা হতো না। তারা বিশ্বাস করত যে, রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, শক্তি প্রয়োগ করেই রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তবে এদের বহুল প্রতিশ্রুত লক্ষ্য ছিল-

মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল

ফ্যাসিবাদের মূলনীতি

ক. রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করা;
খ. ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা;
গ. ইতালিকে বিশ্বরাষ্ট্রে উন্নীত করার উপযোগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা;
ঘ. দেশ থেকে সমাজতন্ত্র নির্মূল করা।

ফ্যাসিবাদীরা পুঁজিবাদেরই সমর্থক ছিল। তবে তারা লক্ষ্য পূরণের জন্য গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসোলিনী পার্লামেন্টকে 'শুয়োরের খামার' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ০৯ মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

টপিক ০৯: মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

অভ্যন্তরীণ নীতি

মুসোলিনী কমিউনিজমকে ঘৃণা করলেও তার সরকারকে 'সোভিয়েত' মডেলে গড়ে তোলেন। গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলা হয়, যার সর্বোচ্চ চূড়ায় তিনি নিজে অবস্থান করেন। ২০ জন বাছাই করা ফ্যাসিস্ট নেতা নিয়ে 'ফ্যাসিস্ট গ্র্যান্ড কাউন্সিল' গঠিত হয়। সরকারি চাকরিতে শুধু ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্য কিংবা এ আদর্শের প্রতি যারা অনুগত তারাই যোগদান করতে সক্ষম হতো। সেনাদল, পুলিশ প্রশাসন- সর্বস্তরের দায়িত্বশীল পদে দক্ষ ফ্যাসিস্টদের বসানো হয়। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে বিলুপ্ত করে শ্রমিক ও মালিক সমন্বয়ে করপোরেশন গঠন করা হয়। করপোরেশন কোনো সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে ট্রাইব্যুনাল কোর্টে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। ধর্মঘট ও লে-অফ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

বেকার সমস্যা দূর করার জন্য মুসোলিনী 'শিফট' প্রথার মাধ্যমে কারখানায় কাজ ও শ্রমঘণ্টা কমিয়ে অধিক শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মহিলাদের গৃহকর্মে উৎসাহিত করা হয়। কর্মজীবী মহিলারা বিবাহ করলে বিবাহ ঋণ প্রদান করা হয় এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ হ্রাস না করে বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়। মহিলাদের গৃহকর্মে পাঠিয়ে যে পদগুলো শূন্য হয় সেখানে পুরুষদের নিয়োগ দেয়া হয়।

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

অভ্যন্তরীণ নীতি

কৃষির উন্নয়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়; গমের উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হয়, যাতে খাদ্যের জন্য ইতালিকে পরমুখাপেক্ষী হতে না হয়। সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে মুসোলিনী রেল বিভাগের আয় বৃদ্ধি করেন। তার সময়ে ইতালীয় ট্রেন ঘড়ির কাঁটা অনুসরণ করে চলাচল করত। জল-স্থল ও বিমান বাহিনীর আধুনিকীকরণ করে মুসোলিনী তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। জাতীয় বাহিনীকে শুধু তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করা হয়। রাশিয়া-গ্রিস-তুরস্ক ইত্যাদি দেশের জন্য জাহাজ নির্মাণ করার ভার নিয়ে ইতালি তার নৌ-শক্তিকেও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়। ১৯২৭ সালে মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, 'ফ্যাসিস্ট ইতালির কর্তব্য হলো ইতালির পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীকে সব সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা যাতে ৫০ লক্ষ সৈন্যকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করতে পারি সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই আমরা আমাদের দাবি ও অধিকারের স্বীকৃতি পাব।'

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্র নীতি

মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রসারণবাদ। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে ইতালির আধ্যাত্মিক অধিকার বলে দাবি করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ভার্সাই সন্ধির প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ইতালির সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, ও জার্মানি ইত্যাদি শক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে। এজন্য তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে জার্মানির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিকে সম্মিলিতভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে ইতালির প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার কৌশল অবলম্বন করেন। ১৯২৩ সালে ইতালির জনৈক সেনাপতিকে হত্যার অভিযোগে মুসোলিনী গ্রিসের কর্ষু দ্বীপটি দখল করে নেন। অতঃপর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গ্রিস ক্ষমা প্রার্থনা করলে ও ক্ষতিপূরণ দানে সম্মত হলে মুসোলিনী কফু হতে তার সৈন্য প্রত্যাহার করেন। কর্মুর ঘটনা দেশে মুসোলিনীর জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বৃদ্ধি করে।

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্র নীতি

ভার্সাই সন্ধির পর ইতালি যুগোশ্লোভিয়ার ফিউম বন্দর দখল করেছিল কিন্তু মিত্র শক্তির চাপে তা ছেড়ে দেয়। এখন পুনরায় মুসোলিনী ফিউম বন্দরসহ ইস্ট্রিরা, ডালমাটিয়া, ইল্লিরিয়া, ট্রেনটিনো, ট্রিয়েস্টি, দক্ষিণ টাইরল ইত্যাদি অঞ্চলের ওপর দাবি উত্থাপন করলে ১৯২৫ সালে যুগোশ্লোভিয়া নেডিউনো চুক্তির মাধ্যমে এসব অঞ্চলে ইতালিকে বাণিজ্য অধিকার দান করে।

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্র নীতি

১৯২৬ সালে মুসোলিনী আলবেনিয়ার সাথে তিরানা চুক্তি স্বাক্ষর করে কিছুটা সুবিধা আদায় করেন। ১৯২৭ সালে হাঙ্গেরির সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করে মুসোলিনী যুগোশ্লোভিয়াকে কোণঠাসা করে ফেলেন। ফলে ১৯২৯ সালে স্যালোনিকা অঞ্চলের ওপর থেকে যুগোশ্লোভিয়া তার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসি বিপ্লব সফল হলে ফ্রান্স 'ইতালি-জার্মান' মিত্রতা রোধ করার জন্য ইতালির সাথে তার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩৫ সালে 'ফ্রাঙ্কো-ইতালি' চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স সোমালিল্যান্ড-এর কিছু অংশ ইতালিকে ছেড়ে দিয়ে ইতালির সাথে বন্ধুত্ব করে।

১৮৯৬ সাল থেকেই ইতালি আবিসিনিয়া দখল করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওই বছর ইতালি তাদের কাছে পরাজিত হয়। মুসোলিনী সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন গোপন সমর্থন দেয়। ১৯৩৫ সালে ইতালি আবিসিনিয়ার সীমান্তবর্তী 'ওয়াল-ওয়াল' গ্রামে প্রবেশ করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। জাতিসংঘ এ সমস্যার সমাধানে কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু বহু রাজনীতি-কূটনীতির পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কৌশলী সহায়তায় ইতালি ১৯৩৬ সালে আবিসিনিয়া দখল করে নেয়। ১৯৩৯ সালে মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করে নেন। অতঃপর মুসোলিনী স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্র নীতি

আবিসিনিয়া দখল করার পর ইতালির সাথে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মনোমালিন্য বেড়ে যায়। মুসোলিনী নিজ শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য জার্মানির হিটলারের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। জার্মানি ও ইতালির মধ্যে 'এন্টি-কমিনটার্ন' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৩৯ সালে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতালি কৌশলগত কারণে কিছু দিন নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু হিটলারের বাহিনী সুইডেন ও বেলজিয়াম দখল করে ফ্রান্সে ঢুকে পড়লে মুসোলিনী মনে করেন যে, মিত্রপক্ষ পরাজিত হতে চলেছে। ফলে ১৯৪০ সালে মুসোলিনী ফ্রান্স আক্রমণ করেন। হিটলারের জার্মান বাহিনী যখন রাশিয়ায় ব্যস্ত ছিল তখন মুসোলিনী উত্তর আফ্রিকায় ফরাসি ও ব্রিটিশ উপনিবেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু এটি ছিল তার ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা, আফ্রিকায় ফ্রান্স-ব্রিটেন ও মার্কিন বাহিনীকে ইতালির একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া জার্মান সৈন্যরা রাশিয়ায় ব্যস্ত থাকায় ইতালিকে সময়মতো সাহায্য দিতে পারেনি। ফলে আফ্রিকায় ইতালির শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১০ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক ১০: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। বিশ্বের ৬১টি দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের সব মহাদেশ ও মহাসাগর এ যুদ্ধে আক্রান্ত হয়। ৬ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এর চেয়েও বহুগুণ মানুষ আহত হয় এবং পঙ্গুত্ববরণ করে। অনেকে মনে করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে গৃহীত বিশ্বব্যবস্থাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি (Deficiency of the Treaty of Versailles): বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯) মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। এ সন্ধিতে পরাজিতের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়নি। বরং পরাজিত জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করে ফেলার জন্য অপমানজনক সব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলো জাতিকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ না করলে জার্মান জাতির কলঙ্ক মোচন হবে না। ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদ তীব্রভাবে বিকশিত হয়। প্রতিটি জার্মান প্রতিশোধ স্পৃহায় জেগে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের পতন (Fall of Weimer Republic): ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। এ প্রজাতন্ত্র ছিল সহনশীল ও শান্তিপ্রিয়। এ প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিতান্ত বাধ্য হয়েই ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করেছিল বিধায় তা সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করত। তবে পুরো সন্ধি ভেঙে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু নাৎসিদল এ প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হলে শান্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

একনায়ক হিটলারের উত্থান (Rise of Dictator Hitler): হিটলার ছিলেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতীয়তাবাদী একনায়ক। তিনি ভার্সাই সন্ধি ভাঙার ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এছাড়া তিনি বিশুদ্ধ জার্মান রক্তের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতারোহণ তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। তিনি ভার্সাই সন্ধির ত্রুটিগুলো সম্পর্কে এমন যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা প্রচার করেন যে, এর ফলে বিশ্বজনমত এ সন্ধির বিরুদ্ধে চলে যায়। এ সুযোগে তিনি তার সমরসজ্জা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বমন্দা (World Depression of 1929-30): ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী দেশগুলো অর্থনৈতিক মহামন্দায় পতিত হলে সরকারগুলো নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলায় হিমশিম খায়। এ সুযোগে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ ইতালি ও জার্মানির জনগণকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

হিটলারের সফল কূটনীতি (Successful Diplomacy of Hitler): হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। বরং পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে এবং রাশিয়াকে মিত্রহীন করে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো একে একে দখল করে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। এভাবে শক্তি বৃদ্ধি করার পর সর্বাত্মক আক্রমণ করে পুরো ইউরোপকে পদানত করা সম্ভব হবে। এজন্য হিটলার পোল-জার্মান চুক্তি, মিউনিখ চুক্তি, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কমিউনিস্ট, আতঙ্কে ভীত ইংল্যান্ডকে তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতার মাধ্যমে পক্ষে আনেন। এভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে অতঃপর একে একে চুক্তিগুলো ভঙ্গ করে এক এক করে রাষ্ট্রগুলোকে আক্রমণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

ইংল্যান্ডের জার্মান তোষণনীতি (German Appeasement Policy of England): রুশ বিপ্লবের বিস্তারের ভয়ে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন জার্মান তোষণনীতি অনুসরণ করেছিলেন। এজন্য তিনি হিটলারের শক্তি বৃদ্ধিতে ইউরোপীয় শক্তিসাম্য গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সুযোগে হিটলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হন। জার্মান আগ্রাসন রোধে রাশিয়ার জার্মানবিরোধী জোট গঠনের প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন গ্রহণ না করে বড় ভুল করেন। বহু ঐতিহাসিকের ধারণা, হিটলার ১৯৩৬ সালে ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করে রাইনল্যান্ড পুনরুদ্ধার করলে যদি ফ্রাঙ্কো- ব্রিটিশ বাহিনী জার্মানি আক্রমণ করত তাহলে হিটলার এতটা দুর্বার হওয়ার সাহস পেত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

ইতালি ও জাপানের আগ্রাসী নীতি (Aggressive Policy of Italy and Japan): ইতালিতে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর উত্থান এবং এশিয়ায় জাপানের উত্থান হিটলারকে সাহস প্রদান করে। এর ফলে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি জোট গড়ে ওঠে।

সোভিয়েতের প্রতি অবিশ্বাস (Unreliability on Soviet Union): ১৯১৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্ববিপ্লবের হুমকি প্রদান করলে বুর্জোয়া দেশগুলো আতঙ্কিত হয়। এজন্য নাৎসি উত্থানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জার্মানবিরোধী জোট গঠনের প্রস্তাব ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড গ্রহণ করেনি। এর ফলে হিটলার রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে তার শক্তি বৃদ্ধি করেন। আবার, হঠাৎ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করে রাশিয়াকে হতভম্ভ করে দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংঘাত (Imperialistic Conflict): ভার্সাই সন্ধি ও অন্যান্য চুক্তির মাধ্যমে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি বিশ্বব্যাপী তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। জার্মানিকে অগ্রসর হতে দিলে তাদের এ ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এজন্য জার্মানির পূর্ব-ইউরোপমুখী সম্প্রসারণকেই ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি সন্দেহের চোখে দেখে। এদিকে ব্রিটেন দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য পরিচালনা করায় জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঈর্ষার কারণ হয়। এজন্য জাপানও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১১ অক্ষশক্তি চুক্তি

টপিক ১১: অক্ষশক্তি চুক্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অক্ষশক্তি চুক্তি

১৯৩৬ সালে লীগ অব নেশনস-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জার্মানি ইতালিকে আবিসিনীয় যুদ্ধে সমর্থন জানায়। এর ফলে ইতালি-জার্মান সখ্য গড়ে ওঠে। এরপর উভয় রাষ্ট্রই কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তিই পরবর্তীতে রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তিতে পরিণত হয়। এ চুক্তির গুরুত্ব এই যে, এ চুক্তির ফলে ইতালি-জার্মান জোট ফ্রান্সকে বেষ্টন করে ফেলে। একই বছর নভেম্বরে হিটলার কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করার জন্য জাপানকে নিয়ে একটি চুক্তি (Anti-Comintern Treaty) সম্পাদন করলে ইতালি-জার্মানি-জাপান ঐক্য জোট গড়ে ওঠে। ইতিহাসে এটি অক্ষশক্তি হিসেবে পরিচিত।

অক্ষশক্তি চুক্তি

মিত্রশক্তি জোট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রি-শক্তি আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হলে এ সুযোগে জার্মানি তার হারানো শক্তি সংহত করার সুযোগ পায়। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে ইতালিকে ঠকানো হলে সেও মিত্রশক্তি জোটের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেখানে মুসোলিনীর মতো আগ্রাসী ফ্যাসিস্ট নেতার উদ্ভব ঘটে। জার্মানি ও ইতালি একত্রিত হয়ে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা জার্মানি ও ইতালিকে প্রতিহত করে ইউরোপের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য যুদ্ধ বেঁধে গেলে ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্রিটেন ও রাশিয়া 'লেন্ড এন্ড লীগ' (Lend and League) চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশ দুটিতে রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। একই বছর আগস্টে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বিখ্যাত আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) ঘোষণা করেন। এ চার্টারে যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির করা হয়, যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনা স্থির করা হয়। এর আলোকে ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বের ২৬টি দেশ সম্মিলিতভাবে আটলান্টিক সনদের ভিত্তিতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অক্ষশক্তি চুক্তি

মিত্রশক্তি জোট

একই বছর ব্রিটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য কতিপয় গোপন চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৯৪৩ সালে এই তিন দেশের সাথে ফ্রান্সের নেতা চার্লস দ্য গল মিলিত হয়ে কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে অক্ষশক্তির পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই বছর কায়রো সম্মেলনে চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাইশেককে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, যুদ্ধে জয়লাভ করলে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোনো দেশে উপনিবেশ বিস্তার করবে না। চীনকে আরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, ১৮৯৫ সালের পর থেকে জাপান চীনের যে সব স্থান দখল করেছে তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে কুইবেক সম্মেলনে রাশিয়াকে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় তার আধিপত্য মেনে নেয়া হবে। গ্রিসে ব্রিটেনের আধিপত্যও মেনে নেয়া হয়।

এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন বৃহৎ মিত্র শক্তিজোট গঠন করে। এ শক্তিজোট ইউরোপে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুললে জার্মানির একার পক্ষে দুই ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

টপিক ১২: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের প্রায় সব দেশ অংশগ্রহণ করে। এ যুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। ফলে এ যুদ্ধে অসংখ্য লড়াই সংঘটিত হয়। নতুন নতুন মারণাস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এ যুদ্ধেই প্রথম আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্ব জানতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লড়াই আর ধ্বংসের ক্ষত নিয়ে পৃথিবী এখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার সাক্ষী হয়ে আছে। নিচে যেসব লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তন করেছিল সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ (German Invasion in Poland)

১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্তপথে উত্তর ও দক্ষিণ দুদিক দিয়ে পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলো জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সেসময় সামরিক প্রস্তুতির দিক দিয়ে দুর্বল অবস্থানে থাকায় জার্মান বাহিনীকে বাধাদানের পরিবর্তে সমর প্রস্তুতিতেই অধিক নজর দিতে হয়। এর ফলে জার্মান মোটর ও ট্যাংক সজ্জিত স্থলবাহিনী, দূরপাল্লার কামান ও বিমান আক্রমণে পুরানো অস্ত্রসজ্জিত পোল বাহিনী শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। জার্মানি পোল্যান্ড অধিকার করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর দিকে নজর দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

বেলজিয়াম ও হল্যান্ড আক্রমণ ও দখল (Invading and Occupying Belgium and Holland)

পোল্যান্ড আক্রমণের পরপরই ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করলে হিটলার ফ্রান্সের দিকে নজর দেন। জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফ্রান্স তার পূর্ব সীমান্তে মাটির নিচে ও ওপরে 'ম্যাজিনো লাইন' নামে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা দুর্গের সারি তৈরি করেছিল। ফলে জার্মানি বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেলজিয়াম ও হল্যান্ডে নাৎসি বাহিনী ঝটিকা অভিযান চালায়। এই আক্রমণে জার্মান বাহিনী যে নিখুঁত সমর পরিকল্পনা ও গতিশীলতার পরিচয় দেয় তা সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯৪০ সালের ১০ মে নাৎসি বাহিনী একযোগে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড আক্রমণ করে। ২৮ মে বেলজিয়ামের রাজা লিউপোল্ড আত্মসমর্পণ করেন। ইতিপূর্বে ১৩ মে'র মধ্যেই হল্যান্ডের পতন ঘটেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

ফ্রান্স আক্রমণ (Invasion in France)

বেলজিয়াম ও হল্যান্ড অধিকার করার পর ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে যে তিনটি স্থান বেলজিয়াম জার্মানির কাছ থেকে অধিকার করে সেগুলো জার্মানির সাথে সংযোজন করে ভার্সাই সন্ধির একটি শর্ত সংশোধন করা হয়। হিটলার বাহিনী অতঃপর ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

ডানকার্ক সংকট (Crisis of Dunkark)

বেলজিয়াম রক্ষার জন্য ইঙ্গ-ফরাসি সরকার প্রায় চার লক্ষ সেনা মোতায়েন করে। কিন্তু হিটলার বাহিনী দশটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ৩০০০ সাজোয়া যান ও ৮৯ নম্বর পদাতিক ডিভিশন মিত্রপক্ষের রক্ষণব্যূহ ভেদ করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উত্তর ফ্রান্সের সমগ্র এলাকা দখল করে নেয়। ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে 'ডানকার্ক' বন্দরে আটকা পড়ে। ১৯৪০ সালের ২৭ মে থেকে ৪ জুন এর মধ্যে ৮৫০টি নৌযানের মাধ্যমে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর সাড়ে তিন লাখ সৈনিক ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যরা নাৎসি বাহিনীর হাতে নিহত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

ক্যাম্পেইন প্রতিশোধ (Revenge at Campaign)

অতঃপর হিটলার 'ক্যাম্পেইন' নামক স্থানে একটি রেলগাড়ির কামরায় বসে (যে রেলগাড়ির কামরায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছিল) ১৯৪০ সালের ২১ জুন ফ্রান্সকে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করলেন। এভাবে হিটলার স্বয়ং উপস্থিত থেকে ফরাসি বাহিনী কর্তৃক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন একই রকম নাটক মঞ্চস্থ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলি

ক্যাম্পেইন প্রতিশোধ (Revenge at Campaign)

অতঃপর হিটলার 'ক্যাম্পেইন' নামক স্থানে একটি রেলগাড়ির কামরায় বসে (যে রেলগাড়ির কামরায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছিল) ১৯৪০ সালের ২১ জুন ফ্রান্সকে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করলেন। এভাবে হিটলার স্বয়ং উপস্থিত থেকে ফরাসি বাহিনী কর্তৃক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন একই রকম নাটক মঞ্চস্থ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১৩ তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

টপিক ১৩: তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পতন দেখে ইতালির ফ্যাসিবাদী সরকার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সের কিছু অংশ দখল করে নেয়। এরপর জার্মান অধিকৃত উত্তর ফ্রান্স এবং ইতালি অধিকৃত স্থানসমূহ বাদ দিয়ে ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশে হিটলার তার প্রতি অনুগত ভিচি (Vichy) সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবে ফ্রান্সকে যুদ্ধ ত্যাগে বাধ্য করার পর হিটলার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War against Britain)

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনী ডানকার্ক বন্দর দিয়ে মাত্র ৬ দিনে ৩,৩০,০০০ ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ইংল্যান্ডে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যদি এই সৈন্যবাহিনী সরানো সম্ভব না হতো তাহলে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর বৃহত্তর অংশ জার্মানির হাতে বন্দি হতো। এর ফলে মিত্রপক্ষ আর লড়াই করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু বিচক্ষণ উইনস্টন চার্চিল (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) দক্ষতার সাথে সৈন্য অপসারণ করেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ এখন ইংল্যান্ড থেকেই চলবে। ইংল্যান্ড শেষ রক্তবিন্দুর মাধ্যমে জার্মানির প্রতিরোধ করবে।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

ইংল্যান্ডের উপকূলে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (Coastal Defence of England)

ইংল্যান্ড ছিল নৌ-যুদ্ধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। হিটলার চেয়েছিলেন তার ডুবোজাহাজ দিয়ে ব্রিটিশ রণতরিগুলো ডুবিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের উপকূলে সৈন্যবাহিনী নামিয়ে ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার জার্মানদের উপকূল পথে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপকূলবর্তী ঘরবাড়ি, কলকারখানা ভেঙে দিয়ে উপকূল বরাবর বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে এবং বড় বড় কামান মোতায়েন করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। ইংল্যান্ড ১৯৪১ সালের প্রথম ভাগেই সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করে ৪০ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

জার্মানি কর্তৃক ইংল্যান্ডে বিমান আক্রমণ (Air-Attack of Germany in England)
ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ভেদ করে উপকূল পথে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করতে না পেরে হিটলার ১৯৪০ সালের মধ্যভাগ থেকে ইংল্যান্ডে প্রতিদিন বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। জার্মানির বোমারু বিমানগুলো প্রতিদিন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে আক্রমণের মাধ্যমে বিশেষ করে লন্ডন শহরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে থাকে।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

জার্মানি কর্তৃক ইংল্যান্ডে বিমান আক্রমণ (Air-Attack of Germany in England)

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ভেদ করে উপকূল পথে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করতে না পেরে হিটলার ১৯৪০ সালের মধ্যভাগ থেকে ইংল্যান্ডে প্রতিদিন বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। জার্মানির বোমারু বিমানগুলো প্রতিদিন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে আক্রমণের মাধ্যমে বিশেষ করে লন্ডন শহরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে থাকে।

ইংল্যান্ডের প্রতিরোধ (Resistance of England)

১৯৪০ সালের ২৫ আগস্ট থেকেই ব্রিটিশ বিমানবাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী অক্টোবরের মধ্যেই ২৩৭৫টি জার্মান বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এরপর পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিমান জার্মানির বড় শিল্পাঞ্চল, লোহার কারখানা, রেলওয়ে জংশন, কোলন নগরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে থাকলে হিটলার বিমান আক্রমণ হ্রাস করতে বাধ্য হন।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদান (Joining to the War of Russia)

জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে রাশিয়া ১৯৩৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব-পোল্যান্ড আক্রমণ করে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির শর্তানুযায়ী কিছু অংশ দখল করে নেয়। জার্মানি এতে স্বীকৃতিদান করে। রাশিয়া এরপর জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রুশ সীমান্ত রক্ষার জন্য তিন বাল্টিক রাষ্ট্র- লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া দখল করে নেয়। রাশিয়া এরপর ফিনল্যান্ডকে তার সামরিক নিয়ন্ত্রণ মানতে আহ্বান জানায়। ফিনল্যান্ড অস্বীকার করলে রুশ বাহিনী ফিনল্যান্ড দখল করে নেয়।

তাঁবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

বলকান অঞ্চলে অক্ষশক্তির সাফল্য (Success of Axis power at Balkan Area)
ইতালীয় বাহিনী বলকান অঞ্চলে গ্রিস আক্রমণ করলে গ্রিস মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলে ইংল্যান্ড ভূ-মধ্যসাগরের জলপথ রক্ষা ও ইতালি আক্রমণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৩ সালে বুলগেরিয়া অক্ষশক্তিতে যোগদান করে গ্রিক অধিকৃত বলকান অঞ্চলগুলো পুনরাধিকারের উদ্যোগ নেয়। সাথে সাথে জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে যুগোশ্লোভিয়া আক্রমণে অগ্রসর হয়। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল যুগোশ্লোভিয়াকে ভয় দেখিয়ে এর মধ্য দিয়ে জার্মান সৈন্য চলাচলের অধিকার আদায় করা। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যুগোশ্লোভিয়াকে জার্মানির বিরুদ্ধে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানায়। অন্তঃবিপ্লবের ফলে যুগোশ্লোভিয়ার রাজা 'পল' সিংহাসনচ্যুত হয়ে পালিয়ে গেলে পরবর্তী রাজা পল দ্বিতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেই জার্মানির সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে গ্রিস ও যুগোশ্লোভিয়ায় জার্মান সেনা প্রবেশ করে অতি সহজেই তা অধিকার করে নেয়। অতঃপর যুগোশ্লোভিয়াকে ইতালি, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এভাবেই গ্রিস, বেলগ্রেড ও ক্রীট দ্বীপ জার্মান অধিকারে আসলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইংল্যান্ড সম্পূর্ণ মিত্রহীন হয়ে পড়ে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১৪ ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

টপিক ১৪: ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

আফ্রিকায়ও মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। ফ্রান্স জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণের পর আফ্রিকার ফরাসি বাহিনী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করে দিলে ইংরেজ বাহিনী সংকটে পড়ে। সে সুযোগে ইতালি ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল করে মিশর ও সুয়েজ খাল দখল করার জন্য এগিয়ে যায়।

আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্য (Success of Allied Force in Africa)

জার্মানি যখন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তখন ইতালি একাই মিশর ও সুয়েজ অভিমুখে এগিয়ে যায়। কিন্তু মিত্রশক্তির প্রবল প্রতিরোধের মুখে সুবিধা করতে না পারায় জার্মানির সহায়তা কামনা করে। জার্মান বিমান বাহিনী যদিও ইতালির সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল তথাপি তারা মূলত রাশিয়ায় ব্যস্ত থাকায় এদিকে ততটা মনোযোগ দিতে পারেনি। এ সুযোগে মিত্রশক্তি আবিসিনিয়ার সিংহাসনচ্যুত রাজা হাইলি-সেলাসির সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও ইতালি অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকা দখল করে নেয়। হিটলার এজন্য মুসোলিনীকে তিরস্কার করেছিলেন। ইতালীয় সেনাপতি রোমেলও উত্তর আফ্রিকায় মিত্রবাহিনীর সেনাপতি অচিনলেকের কাছে পরাজিত হয়ে উত্তর আফ্রিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির সাফল্য (Success of Allied Force in the Middle East)

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ফরাসি সেনাপতি দ্য গল ১৯৪১ সালে তার সামান্য সংখ্যক ফরাসি সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সের বাইরে এক স্বাধীন ফরাসি সরকার গঠন করে ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে যৌথভাবে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। ইংরেজ ও দ্য গলের বাহিনী যৌথভাবে মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানির আক্রমণ থেকে সিরিয়াকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ (Russia Attacked by Hitler)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অল্পকাল পূর্বেই হিটলার রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন মিত্রশক্তির কাছ থেকে অনেকটা মুখ ফিরিয়েই রেখেছিলেন। হিটলার ভাবলেন শেষ পর্যন্ত রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেই। এজন্য আগেভাগে আক্রমণ করে রাশিয়াকে দুর্বল করে ফেলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভেবে ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। জার্মানির সমরনায়করা বহুপূর্ব থেকেই ইউরোপে পূর্ব ও পশ্চিম-এই দুই ফ্রন্টে জার্মানির যুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে এসেছিল। হিটলারও দুই ফ্রন্টে যুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন 'পূর্বপ্রান্তে দ্রুত রাশিয়াকে পর্যুদস্ত করে সেই বিজয়ী বাহিনীকে তিনি পশ্চিম প্রান্তে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবেন। মাত্র ২৬ দিনেই জার্মান বাহিনী মস্কোর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। মস্কো অবরুদ্ধ হলে রুশ বাহিনী 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করে পশ্চাদপসরণ করে।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

অক্টোবর মাসে মস্কো অবরুদ্ধ হয়। রুশ লালফৌজ প্রবলভাবে জার্মানদের বাধা দেয়। ইতোমধ্যে প্রবল শীত শুরু হয়ে গেলে জার্মান বাহিনীর পক্ষে বার্লিনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালের প্রথমে রুশ বাহিনী লেনিনগ্রাড মুক্ত করতে সমর্থ হয়। সেপ্টেম্বরে শুরু হয় স্ট্যালিনগ্রাড উদ্ধারের লড়াই। নভেম্বরে রুশ সেনাপতি ঝুকভ জার্মানদের বার্লিনের সাথে যোগাযোগ পথ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হলে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে জার্মান বাহিনী রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান (Joining to the War of USA)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানকার জনমত ক্রমেই মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলে ১৯৪১ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 'Lend-Lease Act' পাস করে যুদ্ধরত মিত্রশক্তিকে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে জার্মান ডুবোজাহাজগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিতে শুরু করলে মার্কিন নৌবাহিনীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এর কয়েক মাস পর অক্ষশক্তির সদস্য জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পার্ল হারবার' আক্রমণ করলে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

যুদ্ধের গতি পরিবর্তন; ইতালির পরাজয় (Change of the Course of War; Defeat of Italy)
১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৩ সালের মে মাসের মধ্যে মিত্রশক্তি তিউনিসিয়া ও বির্জাটা দখল করে নিলে আফ্রিকা থেকে ইতালি বিতাড়িত হয়। এ বছর ১৭ আগস্ট সিসিলি অভিযানে মিত্রপক্ষ সফল হলে মুসোলিনী অপসারিত হন। সেপ্টেম্বরে মার্কিন বাহিনী পশ্চিম ইতালি অধিকার করতে সক্ষম হয়।
১৯৪৪ সালের জুনে রোম মিত্রপক্ষের পদানত হয়। ১৯৪৫ সালে ইতালি আত্মসমর্পণ করে।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

ইউরোপে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্টের লড়াই শুরু (Allied Forces War at the Second Front in Europe)

১৯৪১ সালের জুনে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে স্ট্যালিন মিত্রপক্ষকে ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে বিলম্ব করে। অবশ্য ১৯৪৩ সালে যখন রুশ বাহিনীর কাছে জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটে, তখন জার্মানির বিরুদ্ধে স্টালিন যেন এককভাবে কৃতিত্ব দাবি করতে না পারে সেজন্য ইঙ্গ-মার্কিন জোট দ্রুত যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে একমত হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৪ সালের ১ জুন উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের নরমান্ডি দিয়ে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণ করবে। প্রথমে ৩৬ ডিভিশন সৈন্য ও পরে ১০ ডিভিশন সৈন্য নামানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। ১০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বিমান এ যুদ্ধে অংশ নেয়। জার্মান গোয়েন্দারা মিত্রবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ সংগ্রহ করতে বিলম্ব করে ফেলেন। মিত্রবাহিনী যখন ফ্রান্সে অবতরণ করে তখন জার্মান সেনাপতি রোমেল বার্লিনে ছিলেন।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

বিলম্বে খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ফ্রান্সে ফিরে আসেন, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে যায়। মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনী রাতে অতর্কিত বিমান আক্রমণের মাধ্যমে উপকূলবর্তী জার্মান প্রতিরক্ষাব্যূহ তছনছ করে দেয়। ৬ জুন গভীর রাতে মিত্রবাহিনী ফ্রান্সের ৫টি স্থানে অবতরণ করে। ৫ দিন ধরে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাথে জার্মান বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। মিত্রবাহিনী নরমান্ডির ১২৮ কি. মি. উপকূল এলাকা দখল করে আরও ৩২ কি. মি. অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

ইতালির ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড দখল

সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ইউরোপে জার্মান প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এদিকে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে রুশ বাহিনী বার্লিনের ৯৬ কি.মি. এর মধ্যে এসে পড়ে। ২১ এপ্রিল রুশ বাহিনী বার্লিন শহরে প্রবেশ করলে রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এদিকে ২৫ এপ্রিল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সাথে টোরঘাউ শহরের কাছে রুশ বাহিনীর সাক্ষাৎ হয়। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। ৯ মে শেষ রাতে জার্মান প্রতিনিধিবর্গ মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি আইজেন হাওয়ার-এর কাছে ফ্রান্সের 'রেইমস' শহরে তার সদর দপ্তরে আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন- এই চারটি রাষ্ট্রের ৪টি দলিলে জার্মানরা স্বাক্ষর করেন। জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল জাি বিজয়ী পক্ষের কাছে থেকে উদার ব্যবহার কামনা করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

টপিক – ১৫ জাপানের পরাজয়

টপিক ১৫: জাপানের পরাজয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাপানের পরাজয়

অক্ষশক্তির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে জাপান এশিয়ায় যুদ্ধের প্রথম দিকে বেশ সাফল্য অর্জন করে। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার আক্রমণ করে। একের পর এক আক্রমণের মাধ্যমে জাপান দূরপ্রাচ্যের ফিলিপাইন, হংকং, ম্যানিলা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার দখল করে নেয়। জাপানের সহায়তায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করে আসাম ও মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন।

জার্মানির পরাজয়ের পর জাপানও পিছু হটতে থাকে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে 'পটসডাম' সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়।

জাপানের পরাজয়

একই বছর ৬ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা নগরীতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এক মুহূর্তের মধ্যেই শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আরেকটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১০ আগস্ট জাপান শান্তি প্রস্তাব পেশ করে।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর মার্কিন রণতরি মিসৌরীতে প্রাচ্যে মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি ম্যাক আর্থারের কাছে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগেমিৎসু আত্মসমর্পণ করেন এবং জাপানি সেনাপতি 'উমেজু' আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। সেই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জাপানের পরাজয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। নিচে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা (Establishment of UN): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বনেতৃবৃন্দের মাঝে এরূপ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ীব্যবস্থা নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব (Beginning of the Cold War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তির উদ্ভব ঘটে। এই দুই শক্তি যথাক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এর ফলে বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করে।

৩. ইউরোপে আধিপত্যবাদের অবসান (Fall of European Supremacy): যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপে আধিপত্যবাদের প্রবণতা হ্রাস পায়। সামরিক সাফল্যের চেয়ে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকেই প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করা হয়।

জাপানের পরাজয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

৪. ঔপনিবেশিকতার অবসান ও স্বাধীন দেশের উদ্ভব (End of Colonialism and Birth of Independent States): বিশ্বযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এর ফলে ইন্দোচীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলো ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। ভারত, পাকিস্তান, ইরান এর উদাহরণ।

৫. পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিকাশ (Development of Socialism in East-Europe): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সাফল্যে ও প্রভাবে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। পূর্ব-জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া রুমানিয়া, আলবেনিয়া ইত্যাদি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়াতে চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইন্দোচীনের একাংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ (Development of Economic Imperialism): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে। তবে বিশ্বায়নের নাম করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রবল প্রতাপে ক্রিয়াশীল।

THANK YOU